কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠ অধ্যায়: বিদ‘আত ও বিভক্তি

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ড. খোন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রহ.)

৬. ৬. ৩. ৩. ইসমাঈলীয়া বাতিনীয়্যাহ শীয়াগণ

শিয়া সম্প্রদায়ের অনেক উপদলের একটি ইসমাঈলিয়্যাহ সম্প্রদায়। আমরা দেখেছি যে, ১২ ইমাম পন্থী ইমামী শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, আলী-বংশের ৬ষ্ঠ ইমাম জা’ফার সাদিকের (১৪৮ হি) পরে তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র মূসা কাযিম (১৮৩ হি) ইমামতি লাভ করেন। কিন্তু ইসমাঈলিয়্যা শীয়াগণ বিশ্বাস করেন যে, জাফর সাদিকের পরে ৭ম ইমাম জাফর সাদিকের জৈষ্ঠ্য পুত্র ইসমাঈল (১৪৮ হি) ছিলেন প্রকৃত ইমাম। তাঁর পরে এই ইমামত তাঁর সন্তানদের মধ্যে থাকে। এদেরকে ইসমাঈলিয়া বাতিনীয়া সম্প্রদায় বলা হয়।

তৃতীয় হিজরী শতকে উবাইদুল্লাহ (২৫৯-৩২২হি) নামক এক ব্যক্তি উত্তর পশ্চিম আফ্রিকায় প্রচার করেন যে, তিনিই ৭ম ইমাম ইসমাঈলের বংশধর ও ইমাম মাহদী। এক পর্যায়ে ২৯৭ হিজরীতে তিনি মাহদী হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করেন এবং তিউনূসের কাইরোয়ানে ফাতিমী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তার সন্তানগণ মিসর ও অন্যান্য এলাকা দখল করেন। প্রায় তিন শতাব্দী পরে ৫৬৭ হিজরীতে সালাহ উদ্দীন আইয়ূবীর হাতে ফাতিমী শীয়া রাজ্যের বিলুপ্তি ঘটে।[1] এরাই মূলত ইসামঈলীয় বাতিনী মতবাদের প্রবক্তা।

বাতিনীয়া শীয়াগণও অন্যান্য শীয়া ফিরকার মতই আলী বংশের ইমামত, ইমামগণের ইসমাত, গাইবী ক্ষমতা, গাইবী ইলম, ইত্যাদিতে বিশ্বাস করেন। তাদের বিশেষ বিশ্বাসের মধ্যে দুটি দিক রয়েছে:

(১) ইমামগণ এবং ইমামগণের মনোনীত বলে দাবিদারদের উলূহিয়্যাত-এ বিশ্বাস। তারা এদেরকে অবতার বা আল্লাহর দেহধারী রূপ বা আল্লাহর বিশেষ সম্পর্কের ব্যক্তি ও ইবাদত বা সর্বোচ্চ ভক্তি পাওয়ার যোগ্য বলে বিশ্বাস করেন। কুরআন, হাদীস ইত্যাদি তাদের কাছে মূল্যহীন। ইমাম বা ইমামের প্রতিনিধি বলে দাবিকারীর বক্তব্যই একামত্র দীন।

(২) ইসলামের নির্দেশের গোপন বা বাতিনী অর্থের নামে ইসলামের সকল বিধিবিধান ও হালাল-হারাম বাতিল করে দেওয়া।

‘বাতিনীয়া’ সম্প্রদায়ের মতামতের মূল ভিত্তি ধর্মের নির্দেশাবলীর ‘বাতিনী’ বা গোপন ব্যাখ্যা। তাঁদের মতে ইসলামের নির্দেশাবলীর দুইটি অর্থ রয়েছে। প্রথমত বাহ্যিক বা যাহিরী অর্থ, যা সকলেই বুঝতে পারে। আর দ্বিতীয় অর্থ বাতিনী বা গোপন অর্থ। এ অর্থ শুধু আলী বংশের ইমামগণ বা তাদের খলীফাগণই জানেন। আর এই গোপন অর্থই ‘হাকীকত’ বা ইসলামের মূল নির্দেশনা। শুধু সাধারণ জাহিলগণই প্রকাশ্য নির্দেশ নিয়ে পড়ে থাকে। আর সত্যিকার বান্দারা গোপন অর্থ অর্থাৎ ইলমে বাতিন ও হাকীকত বুঝে সেমতই তাদের জীবন পরিচালনা করে আল্লাহর প্রিয়পাত্র হন। এই মূলনীতির ভিত্তিতে বাতিনী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন নেতা তাদের ‘ইলম লাদুন্নী’, ‘বাতিনী ইলম’ ও হাকীকতের জ্ঞান (!) দ্বারা তাদের সুবিধামত কুরআনের নির্দেশাবলী ব্যাখ্যা করতেন। ঈমান, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, জিহাদ ইত্যাদি ইবাদতের মনগড়া ব্যাখ্যা করে তারা সেগুলি বাতিল করেন। মদ, ব্যভিচার, ইত্যাদি পাপের মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে তারা সেগুলি বৈধ করে দেন। তাঁদের অনুসারীগণ তাদের এ সকল ব্যাখ্যা ভক্তিভরে

মেনে নিতেন। আবার তাদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে এ সকল ব্যাখ্যার বিভিন্নতার ভিত্তিতে বিভিন্ন উপদল গড়ে উঠত।

তৃতীয়-চতুর্থ হিজরী শতাব্দীতে ইয়ামান, ইরাক, মরক্কো, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে ইসমাইলীয় বাতিনী শিয়াগণ ‘কারামিতা’, ফাতিমিয়া ইত্যাদি বিভিন্ন নামে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। এরা যেহেতু ইসলামের নির্দেশনাগুলিকে নিজেদের মতমত ব্যাখ্যা করত সেহেতু এরা তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য প্রয়োজনমত সন্ত্রাস, নির্বিচার হত্যা, গুপ্ত হত্যা ইত্যাদির আশ্রয় গ্রহণ করত। তাদের অনুসারীরা বিনা যুক্তিতে তাদের আনুগত্য করত। এ সকল সন্ত্রাসীর অন্যতম ছিল হাশাশিয়া নিযারিয়া বাতিনী সম্প্রদায়। যারা পঞ্চম-ষষ্ঠ হিজরী শতাব্দীতে মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস ও গুপ্ত হত্যার অপ্রতিরোধ্য ধারা সৃষ্টি করে।

হাসান ইবনু সাবাহ নামক এক ইরানী নিজেকে ইসমাঈলীয়া ফাতিমীয়া শিয়া মতবাদের ইমাম ও মিসরের শাসক মুসতানসির বিল্লাহ (৪৮৭ হি)-এর জৈষ্ঠ্য পুত্র নিযার-এর খলীফা ও প্রতিনিধি বলে দাবি করেন। তিনি প্রচার করেন যে, বুদ্ধি, বিবেক বা যুক্তি দিয়ে কুরআন ও ইসলামের নির্দেশ বুঝা সম্ভব নয়। কুরআনের সঠিক ও গোপন ব্যাখ্যা বুঝতে শুধু নিষ্পাপ ইমামের মতামতের উপরেই নির্ভর করতে হবে। আর সেই ইমাম লুক্কায়িত রয়েছেন। তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে হাসান নিজে কাজ করছেন। তিনি তার ভক্তদের মধ্যে একদল জানবায ফিদায়ী তৈরি করেন। যারা তার নির্দেশে তাৎক্ষণিকভাবে আত্মহনন সহ যে কোনো কর্মের জন্য প্রস্তুত থাকত। এদের মাধ্যমে তিনি উত্তর পারস্যে আলবুর্জ পর্বতের দশ হাজার কুড়ি ফুট উচ্চ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যরাজি পরিপূর্ণ উপত্যাকায় ‘আল-মাওত’ নামক এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করে তথায় তার রাজনৈতিক কেন্দ্র স্থাপন করেন। সেখান থেকে তিনি তার ধর্মীয়-রাজনৈতিক প্রচারণা চালাতে থাকেন। তার প্রচারিত ‘ধর্মীয়-রাজনৈতিক’ আর্দশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাকেই তিনি শত্রু মনে করতেন তাকে গুপ্ত হত্যা করার নির্দেশ দিতেন। ইসলামের ইতিহাসে ধর্মের নামে বা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ঢালাও গুপ্তহত্যা এভাবে আর কোনো দল করে নি। এসকল দুর্ধর্ষ আত্মঘাতী ফিদায়ীদের হাতে তৎকালীন সুপ্রসিদ্ধ উযির নিযামুল মুলক, প্রসিদ্ধ আলিম নজুমুদ্দীন কুবরা সহ অনেক মুসলিম নিহত হন। পার্শবর্তী এলাকা ও দেশগুলিতে গভীর ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। কারণ কেউই বুঝতে পারতেন না যে, এসকল ফিদাঈদের পরবর্তী টার্গেট কে। হাসানের পরে তার বংশধরেরা আল-মাওত দূর্গ থেকে ফিদাঈদের মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড অব্যাহত রাখে। তৎকালীন মুসলিম সরকারগণ এদের দমনে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন। অবশেষে ৬৫৪ হিজরীতে (১২৫৬ খৃ) হালাকু খার বাহিনী এদের নির্মূল করে।[2]

বর্তমান যুগে আগাখানী শীয়া, ভারতীয় বুহরা শীয়া ইত্যাদি দল বাতিনী শীয়াগণের উত্তরপুরুষ। এছাড়া বর্তমান সিরিয়ার শাসক নুসাইরী বা আলাবী শীয়াগণ এবং লেবানন ও ফিলিস্তিনের দুরয্ সম্প্রদায়ও বাতিনী শীয়াগণের বিভিন্ন শাখা। এদের প্রত্যেকেরই বিশেষ বিশেষ পৃথক আকীদা রয়েছে। তবে বাতিনী সম্প্রদায়ের মুল বিশ্বাস অর্থাৎ ইমামগণের ‘উলূহিয়্যাত’ ও ইসলামী আহকামের অকার্যকারতায় এরা সকলেই বিশ্বাসী।

ফুটনোট

[1] বিস্তারিত দেখুন: মাহমূদ শাকির, আত-তারিখুল ইসলামী ৬/১১১-১১২, ১২৩-১২৪, ১৩৬-১৩৭, ১৬৫-১৬৮, ১৮০-১৮২, ১৯৩-১৯৬, ২০৮-২০৯, ২৩৩, ২৪৮, ২৬৫, ২৮৭-২৮৯, ৩০৩-৩০৭।

[2] আহমদ মুহাম্মাদ জলী, দিরাসাতুন আনিল ফিরাক,পৃ. ২৬৫-৩০৬; মতিওর রহমান, ঐতিহাসিক অভিধান, পৃ. ৯৮।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=13801

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন